যুগান্তর

তারিখ 16 MAY 2017

এ কে এম শাহনাওয়াজ

সন্তানের গ্রেড নিয়ে উদ্বিগ্ন যে মায়েরা

দু'দিন আগে মা দিবস চলে গেল। যদিও মাকে কোনো বিশেষ দিবসে মনে রাখার বিষয় নয়, বছরজুড়েই মা সন্তানের ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার আসনে বসে থাকেন। তবুও দিবস তর্পণ কখনও কখনও আত্মচৈতন্যে আমাদের ফিরিয়ে আনতে পারে। মা দিবসের প্রেরণা আজকের লেখার পেছনে কিছুটা ভূমিকা রেখেছে। তবে মাকে মুখ্য করে লিখলেও এর সঙ্গে কখনও বাবা ও পরিবারও যুক্ত থাকে। আমি জানি না মফস্বলকেন্দ্রিক পরিবারগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি কেমন। নাগরিক পরিমণ্ডলের মতো সন্তানের শিক্ষাজীবনের পথ একইভাবে জটিল করে তোলা হয়েছে কিনা। মায়েরা এখন সন্তান জন্মানোর পর থেকেই উদ্বেগে কাটাচ্ছেন ওদের শিক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়ে। সামর্থ্য থাকলে তো বটেই, কায়ক্লেশে সামর্থ্য তৈরি করতে পারলেও ছুটছেন ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়াতে। নিদেনপক্ষে ইংরেজি ভার্সনে। এটা অনেকটা পারিবারিক মর্যাদার বিষয়ও হয়ে গেছে। এসব স্কুলে কী পড়ানো হচ্ছে আর সাধারণ ধারার স্কুলগুলোর কারিকুলাম কী, তা খোঁজ করার চেষ্টা অনেকেই করছেন না। সন্তান স্কুলের গণ্ডি না পেরোতেই বেশ ইংরেজি বলতে পারছে এবং বাংলায় একটু দুর্বল থেকে যাচ্ছে— এ ধরনের চিত্র কোনো কোনো মায়ের আত্মঅহংকার বাড়িয়ে দিচ্ছে আজকাল। এটি স্বল্পশিক্ষিত থেকে শুরু করে অন্তত সার্টিফিকেটে সুশিক্ষিত মায়েদের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করেছি। আমি একজন আর্কিটেক্ট মাকে স্মরণ করতে পারি, যিনি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, দেশের একটি শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। তার চার বছরের মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে এসেছিলেন আমার এখানে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকের পাড়ে এসে মেয়েকে প্রকৃতি চেনাচ্ছেন। বলছেন, দেখ চারদিকে কত গ্রিন ট্রি। পানিতে ডাকগুলো কেমন সুইম করছে। এখানে অনেক ফিশ আছে। আমি ভাবছিলাম, মেয়েটি বড় হতে হতে না জানি গাছ, সবুজ, হাঁস, সাঁতারকাটা— এসব শব্দ ভুলে যায়।

আমাদের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা বা সরকারি শিক্ষানীতি আরও সংকটে ফেলেছে। এখন তো মায়েদের দিবারাত্রি একটিই লক্ষ্য— সার্টিফিকেট কতটা উজ্জ্বল হয়। আগে এই দুর্ভাবনা শুরু হতো এসএসসি পরীক্ষাকে ঘিরে। এখন শিশুটির শিক্ষাজীবনের শুরু থেকে। আমরা এসএসসি পরীক্ষাকে পাবলিক পরীক্ষা বলি। কারণ সারা দেশের শিক্ষার্থী বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে একই ধারার পরীক্ষা দিয়ে প্রথম সার্টিফিকেট অর্জন করে। এখন শিক্ষার্থীদের মর্যাদা বাড়ানো হয়েছে। এসএসসির আগে আরও দুটো সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা যুক্ত হয়েছে শিক্ষা পদ্ধতিতে। ক্লাস ফাইভে উঠে পিইসি নামে প্রথম পাবলিক পরীক্ষা। অতঃপর ক্লাস এইটে জেএসসি। অর্থাৎ পড়া যে একটি আনন্দের বিষয়, তা শিক্ষার্থী শৈশব থেকেই জানতে পারল না। তাকে সৃজনশীল মেধা বিকাশের যন্ত্রে ছুড়ে ফেলা হল। আর মায়েদের আরও দু'ধাপ উদ্বিগ্ন হওয়ার পথ তৈরি হল। কোচিং-গাইডের পেছনে ছুটতে গিয়ে বাবা-মায়ের ট্যাক আরও খালি হতে লাগল। বেলা শেষে এসব নীতি প্রয়োগের মারপেঁচে কার কী বৈষয়িক লাভ হল জানি না, তবে এটা বুঝতে পারি— শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনে স্বাভাবিক হাঁটার পথে প্রতিবন্ধক দিয়ে বিকলাঙ্গ বানানোর পথ প্রশস্ত করা হল।

আমাদের দেশে দায়িত্ববান ও ক্ষমতাবান কোনো কোনো আমলার মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা থাকে। সর্ববিদ্যায় সবাইকে ছাপিয়ে নিজের জ্ঞান প্রকাশ করার সুযোগ হাতছাড়া করতে চান না তারা। একবার শিক্ষানীতিতে জেএসসি পরীক্ষার প্রস্তাব থাকলেও পিইসি পরীক্ষার কথা ছিল না। শোনা যায়, সে সময়ের ক্ষমতাবান এখন অবসরপ্রাপ্ত একজন আমলার অবদান নাকি এটি। একটি টেলিভিশন টকশোতে এ আমলাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, বাচ্চাদের অমন পরীক্ষা চাপিয়ে দেয়ার অর্থ কী? তিনি গর্বের সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন, শিক্ষকদের ক্লাসে পড়ানোয় আরও দায়িত্বশীল করে তুলতেই নাকি তিনি এই পরীক্ষার চাপে ফেলেছেন। এখন প্রশ্ন, শিক্ষককে না হয় শাসন করা হল; কিন্তু লাখ লাখ শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবারকে অমন শাস্তি দেয়া কেন?

কিন্তু মায়েরা আবার ছুটতে লাগলেন এ-প্লাস বা নিদেনপক্ষে এ-গ্রেড পাওয়ার প্রতিযোগিতায়। আনন্দময় শৈশব হারিয়ে গেল। একপর্যায়ে মনে হল, এসএসসির আগে এ দুটো পরীক্ষার সার্টিফিকেট দিয়ে কী হবে! এটিও একটি সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হয়ে গেল। অনেক স্কুল একটি প্রায়োগিক সুবিধা রাখল। বলা হল, উপরের গ্রেড না থাকলে বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হওয়া যাবে না।

আমি উদ্বিগ্ন মায়েদের বলব, সন্তানের স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার চেয়ে 'ভালো গ্রেড' পেয়ে সামাজিক মর্যাদা বাড়ানো মূল্যবান হতে পারে না। আগে স্বাভাবিকভাবে যে ধরনের মূল্যায়নে স্কুলে বিভাগ বণ্টন হতো, শিক্ষার্থীর মঙ্গল চিন্তায় সে পথে হাঁটার জন্য আমি স্কুল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করব। এ জন্য স্কুলে বাছাই পরীক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে, তবে এতে হয়তো অভিভাবকের চিন্তার বোঝা কিছুটা কমবে। আমি জানি, শিক্ষকরাও বিশ্বাস করেন পরীক্ষায় পাওয়া গ্রেড শিক্ষার্থীর সব ক্ষেত্রে প্রকৃত জ্ঞানের পরিমাপক নয়। মায়েদের বুঝতে হবে এই পিইসি আর জেএসসি পরীক্ষার সার্টিফিকেট পরবর্তী শিক্ষাজীবনে তেমন কোনো ভূমিকা রাখবে না।

এবার নাকি এসএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয় রাজনৈতিক নম্বর দেয়া থেকে সরে এসেছে। তাই ফলাফল আর গ্রেডের হাইব্রিড বিস্ফোরণ অনেকটা কমেছে। এই স্বাভাবিকতা মানতে পারছেন না অনেক অভিভাবক। বিশেষ বলয়ে সাঁতার কেটে এ এবং এ-প্লাস পাওয়ার যে প্রত্যাশা বাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, সেখানে হোঁচট খেয়েছেন কেউ কেউ। এতে পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা দেখা দিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মাকে দেখেছি কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, মেয়ের কোচিংয়ের খরচ মেটাতে সংসারের বাজেট কমিয়ে অধিকাংশ দিন আলুভর্তা-ডাল দিয়ে ভাত খেয়েছি। দুই নম্বরের জন্য মেয়ে এ-মাইনাস পেয়েছে। এতে সবার সামনে মুখ দেখাই কেমন করে আর ভালো কলেজে বিজ্ঞানে ভর্তিই বা করি কেমন করে?

আমি মায়েদের মনঃকষ্ট অনুভব করেও বলব, যুগ যুগ ধরে যে স্বাভাবিকতায় শিক্ষার্থীরা বেড়ে উঠেছে— স্কুলশিক্ষক তাদের পরিচর্যা করেছে, পরিবার সাহায্য করেছে, 'পড়ার সময় পড়া, খেলার সময় খেলা'-এর স্বাভাবিকতায় চারপাশ দেখে জেনে বড় হয়ে যেভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে— আপনার সন্তানকে সেভাবে বেড়ে উঠতে দিন। এ অথবা এ-প্লাস না পেলে একজন মেধাবী শিক্ষার্থী জীবনে হেরে যাবে না। অবশ্য ওজনদার গ্রেড মিলতে পারে ঠিকই, কিন্তু বেলাশেষে স্বাধীন পরিবেশে মেধা চর্চা করে বেড়ে ওঠা শিক্ষার্থীই প্রতিষ্ঠিত হয়— দেশে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও। বিশ্ববিদ্যালয়ে অসংখ্য ছাত্রছাত্রীকে দেখে আসছি— খুব ঝকঝকে সার্টিফিকেটধারী হলেই যে সে ফলে সামনে চলে আসে, তেমন নয়। জেনে-বুঝে বেড়ে ওঠা শিক্ষার্থীটিই শেষ পর্যন্ত পাহাড়ের চূড়া স্পর্শ করে।

আমি মায়েদের প্রতি অনুরোধ রাখব, এ দেশে যুদ্ধ করেই টিকতে হবে। তবে সে যুদ্ধ অস্ত্র প্রয়োগে না মেধা প্রয়োগে সেটাই হচ্ছে আসল কথা। কোচিং-গাইডের গিলিয়ে দেয়া বিদ্যায় ওজনদার গ্রেড মিলতে পারে ঠিকই, কিন্তু বেলাশেষে স্বাধীন পরিবেশে মেধা চর্চা করে বেড়ে ওঠা শিক্ষার্থীই প্রতিষ্ঠিত হয়— দেশে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও। বিশ্ববিদ্যালয়ে অসংখ্য ছাত্রছাত্রীকে দেখে আসছি— খুব ঝকঝকে সার্টিফিকেটধারী হলেই যে সে ফলে সামনে চলে আসে, তেমন নয়। জেনে-বুঝে বেড়ে ওঠা শিক্ষার্থীটিই শেষ পর্যন্ত পাহাড়ের চূড়া স্পর্শ করে।

একটি বাস্তব সংকট তৈরি করা হয়েছে। যেহেতু আমরা বিশ্বাস করি— পরীক্ষায় পাওয়া গ্রেডই সব সময় মেধার পরিচয় নয়, কাজেই তা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির মাপকাঠি হতে পারে না। কিন্তু কর্তৃপক্ষ নিজের চলার পথ স্বস্তিদায়ক করতে এ সহজ পথই বেছে নিয়ে শিক্ষার্থীদের একটি অসুস্থ প্রতিযোগিতায় ফেলে দিয়েছে।

যে দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ কম বলে অনেক ভর্তিপ্রত্যাশী মেধাবী বাদ পড়ে যাচ্ছে, সে দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ কোন্ বিচারে বন্ধ করে দিয়েছে তা আমার বোধগম্য নয়। এখানেও একই উত্তর— নিজেদের পরিচালনার পথ স্বস্তিদায়ক রাখতে। বিস্ময়ের ব্যাপার, দেশের আইন-বিচারও অনেক ক্ষেত্রে নাগরিক অধিকারের পক্ষে থাকে না।

আমি মায়েদের প্রতি অনুরোধ রাখব, এ দেশে যুদ্ধ করেই টিকতে হবে। তবে সে যুদ্ধ অস্ত্র প্রয়োগে না মেধা প্রয়োগে সেটাই হচ্ছে আসল কথা। কোচিং-গাইডের গিলিয়ে দেয়া বিদ্যায় ওজনদার গ্রেড মিলতে পারে ঠিকই, কিন্তু বেলাশেষে স্বাধীন পরিবেশে মেধা চর্চা করে বেড়ে ওঠা শিক্ষার্থীই প্রতিষ্ঠিত হয়— দেশে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও। বিশ্ববিদ্যালয়ে অসংখ্য ছাত্রছাত্রীকে দেখে আসছি— খুব ঝকঝকে সার্টিফিকেটধারী হলেই যে সে ফলে সামনে চলে আসে, তেমন নয়। জেনে-বুঝে বেড়ে ওঠা শিক্ষার্থীটিই শেষ পর্যন্ত পাহাড়ের চূড়া স্পর্শ করে।

ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানো সন্তানদের বাবা-মাকে বলব, আপনারা সামাজিক মর্যাদা বাড়ানোর চেষ্টা করছেন, কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখেছেন কি এসব কারিকুলামে কতটা উজ্জ্বল হয়ে বেড়ে উঠছে সন্তান? যেসব দেশ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে একসময় বন্দি ছিল সেসব দেশের মানুষ ছাড়া অন্যরা খুব কমই ভাবে, ভালো ইংরেজি না জানলে জীবন বৃথা হয়ে যাবে। মাতৃভাষা ভালো না জানলে অন্য কোনো ভাষা ভালো জানা হয় না। ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনার ক্রেজ তো মাত্র এক-দেড় যুগের। তার আগের শিক্ষার্থীরা কি জীবনে ব্যর্থ হয়ে গেছে? ইংল্যান্ড, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ায় পড়তে গিয়ে কি সফল হয়নি? প্রয়োজন মেটানোর মতো অন্য একটি ভাষা শিখে নেয়া খুব কঠিন নয়। চীন, জাপান, জার্মানি, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশের মানুষ ইংরেজি চর্চা তেমনভাবে না করে কি পিছিয়ে পড়েছে? ইংল্যান্ড বাদে প্রায় পুরো পশ্চিম ইউরোপের মানুষ বলতে গেলে ইংরেজি চর্চা করেই না। আমি পর্তুগালের প্রতিথযশা এভোরা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বছর একটি গোলটেবিল বৈঠকে বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়েছিলাম। সেখানে কিছুসংখ্যক শিক্ষক ও গবেষক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল। পর্তুগিজ ছেলেমেয়েগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপে রয়েছে। ওদের পড়াশোনার ভাষা পর্তুগিজ। অধিকাংশ বইপত্র পর্তুগিজ ভাষায় লেখা ও অনুবাদ করা। আমার ইংরেজি বক্তৃতা ওদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল। তাই প্রফেসর ফিলিপ বারাতা মাঝে মাঝে আমাকে থামিয়ে পর্তুগিজ ভাষায় শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

এ দেশের একটি নামি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন পড়ানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার। সেখানে নামি-দামি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল থেকে এ লেভেল, ও লেভেল করে আসা শিক্ষার্থী যেমন থাকে, তেমনি থাকে মূলধারার যেমন— ভিকারুননিসা, হলিক্রস ও নটর ডেম কলেজের মতো প্রতিষ্ঠান থেকে বাংলা মাধ্যমে পড়ে আসা শিক্ষার্থীরাও। আমি লক্ষ্য করেছি, শুদ্ধ ইংরেজি লেখার গুণ ইংরেজি মাধ্যমের চেয়ে এই ধারার কলেজ থেকে আসা শিক্ষার্থীদেরই বেশি।

এসব বাস্তবতা সামনে রেখে মায়েদের কেমন ভূমিকা নেয়া উচিত, তা নতুন করে ভাবতে অনুরোধ করব। এ প্রসঙ্গে মা দিবসের রেশ থাকতে থাকতেই আমি আমার প্রয়াত মায়ের কথা স্মরণ করছি। ছোট্ট আমাদের সময়ে ইংরেজি মাধ্যমের বিষয়-আশয়ের চিন্তা ছিল না। শহরতলীর সাধারণ স্কুলে পড়েছি। মা লক্ষ্য রাখতেন পড়াশোনা, খেলাধুলায় আড্ডা— সব যেন নিয়মমাফিক হয়। মা ঘুটিয়ে পত্রিকা পড়তেন। আমাকেও পড়তে বলতেন। একটি আদেশ ছিল— স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে খেলার মাঠে যাওয়ার আগে বসতে হবে। পত্রিকার সেদিনের উপসম্পাদকীয়টি রেখে দিতেন আমার জন্য। আমাকে জোরে জোরে সেটি শোনাতে হতো। এখন বুঝি তিনি আমার মধ্যে পড়ার একটি অভ্যাস গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। আর এই সূত্রে কখন যে আমার ভেতর কলাম লেখার ইচ্ছে তৈরি হয়েছিল, বুঝতে পারিনি। এখন অনুভব করি আমার গড়ে ওঠার পেছনে মায়ের ভূমিকা ছিল কতটা।

একেএম শাহনাওয়াজ : *অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*

shahnawaz7b@gmail.com